ভূমিকা

সমাজ ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সমাজই সাহিত্যকে তার চিন্তাধারা এবং জীবনধারায় অভিসিঞ্চিত করে, এই জীবন ও জগৎকেই সাহিত্য বাণী রূপ দেয়। আবার সাহিত্য যা সৃষ্টি করে তাই সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সমাজের উপর শিল্পের এই সুগভীর প্রভাব তার মতাদর্শ, তার চিন্তাচেতনাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। এইভাবে সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কে উভয়েই গতিশীলতা লাভ করে।

মঙ্গলকাব্য বলতে আমরা মধ্যযুগের দেবমাহাত্ম্য প্রচারমূলক বিশেষ এক সাহিত্য সংসারকেই বুঝে থাকি। মধ্যযুগের প্রথমার্ধে বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজজীবনে তুর্কি অভিঘাতের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। তাতে সমাজজীবনে যে নানামুখী আলোড়নের সৃষ্টি হয় তার একটি ফসল এক বিশেষ আখ্যানমূলক সাহিত্য ধারা যা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। আর এই সাহিত্য সংসারে মনসামঙ্গল নানা কারণে মনে হয় প্রাচীনতম, আকারে ও প্রকারেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত ব্রতকথা আকারে অনেক আগে এর উদ্ভব হয়। পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গলকাব্য আকারে এর বিস্তৃতি। কানা হরিদত্ত থেকে নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজবংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, জীবন মৈত্র প্রমুখ অনেক কবি এই কাব্য সৃষ্টিকাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় সব কবির কাব্যেই কাহিনীর মূল কাঠামো এবং কথাবস্তুর অভিন্নতা রক্ষিত হয়েছে। তথাপি একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি বিভিন্ন কবির কাব্যে অসংখ্য বৈচিত্র্যের সন্ধান পায়।

আজকের মতো মধ্যযুগের মানুষের চিন্তাপ্রকৃতি বিচিত্র ছিল না। তথাপি কাহিনীর আদর্শগত বৈশিষ্ট্যরক্ষার পাশাপাশি মনসামঙ্গলের কবিরা কাহিনীর বিভিন্ন প্রসঙ্গোপকরণের (Motif) মধ্যে যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবনাচিন্তা বা ঘটনার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন তাকে অস্বীকার করা চলে না। তার মধ্যেই সমাজ ইতিহাসের বা কবির শিল্প অভিপ্রায়ের কোন তাৎপর্য নিহিত থাকতে পারে। মনসামঙ্গল কাব্যে কবিদের এই বৈচিত্র্যসৃষ্টির কারণগুলিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় —

ক) কবিদের ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য, নিজস্ব জীবনদৃষ্টি, যার গুণে স্বাভাবিকভাবেই কবিতে কবিতে পার্থক্য সূচিত হয়।

খ) আঞ্চলিক সামাজিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, রীতি-নীতি, লোকাচার, সংস্কার, জীবনযাত্রা ইত্যাদির প্রভাব যা কাহিনীর বৈচিত্র্যসৃষ্টির অন্যতম কারণরূপে পরিগণিত হতে পারে।

মঙ্গলকাব্যের সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন পুচ্ছানুগ্রাহিতার অভিযোগ এনেছিলেন। একথা ঠিক যে কবিদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া একই কাহিনীধারাকে অবলম্বন করে অমৌলিকভাবে প্রবাহিত হয়েছে। কবি ছাড়াও মধ্যযুগে কাব্যের রূপ গঠনে গায়েনদের ভূমিকা ছিল। তাঁরা মূল কাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক কথা, লৌকিকভাব ও চিন্তাকে উপযুক্ত পালাগানের সঙ্গে সংমিশ্রিত করে দিতেন। গায়কদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত ঘটনার মূল বাংলার তৎকালীন আঞ্চলিক সমাজ পরিবেশের মধ্যেই নিহিত ছিল। বলা যায়, মনসামঙ্গল কাব্যের স্রষ্টা মূলতঃ সমাজ, তথা সমগ্র পারিবেশিক - প্রাতিবেশিক মনন। সন্দেহ নেই, মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থার মূল চরিত্রই ছিল গতানুগতিক। অথচ তারই ভিতরে আঞ্চলিক জীবনযাত্রার খুঁটিনাটির পার্থক্য মৃদু বৈচিত্র্য নিয়ে কৌতূহলের আকর হয়ে উঠত। কৌতূহলী কবিকূল সেই জীবনবৈচিত্র্য থেকে মুখ ফেরাতে পারেন নি। তাঁরা সেই জীবনের যে ছন্দোবদ্ধ রূপ গড়ে তুলেছেন তাতে এক বিশেষ দেশকালের বৃহৎ জনজীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে সেকালের জীবনচর্চার এই ইতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। তার সব অংশে কাব্যের স্বাদ পুরোমাত্রায় যদি নাও মেলে জীবনের ছবির প্রতি কৌতূহল কি পরিহার করা চলে ?

'মনসামঙ্গল' কাব্য বাংলাদেশে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল। পরবর্তীকালের সমাজ রূপান্তরের অভিক্ষেপ তাতেও অনেক পরিবর্তনের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। তাই 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গোপকরণের মধ্যে বাংলার সমাজ জীবনের বৈচিত্র্যময় ছবি আমরা পাই। এদিক থেকে মনসামঙ্গল যেন পাঁচশত বছরের 'জাতীয় জীবনের দলিল' রূপে আখ্যাত হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

মনসামঙ্গল কাব্য শুধুমাত্র বাংলাদেশের (অখন্ড) মধ্যেই নয়, বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। বিহার প্রদেশে ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে মনসা কাহিনীর বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমরা আলোচনাকে কেবলমাত্র বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে আবির্ভূত কবিদের কাব্যের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রচলিত মনসাকাব্যের মধ্যে তিনটি ধারা বর্তমান রয়েছে — পূর্ববঙ্গীয়, পশ্চিমবঙ্গীয় ও উত্তরবঙ্গীয়। ডঃ সুকুমার সেনও অনুরূপ মত দিয়েছেন — "কাহিনীর দিক দিয়া বিচার করিলে মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায় - পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গীয় - অসামীয়া এবং পূর্ববঙ্গীয়।"[১] আলোচনার বিষয় হবে এই তিন ধারার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে কাহিনীর কেন্দ্রীয় মূলের অনুসন্ধান করা এবং সেই সঙ্গে তা কত বৈচিত্র্যে রূপান্তরিত হয়েছে তাও নিরূপণ করা। আর

১। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (প্রথম খন্ড) ?, ষোড়শ শতাব্দী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল - ৯, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা - ১৭৮

. তাতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে, বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতির চলমানতার চিত্র। মনসামঙ্গলের কাহিনী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এবং তার সঙ্গে বহুলৌকিক বৈচিত্র্য এসে যুক্ত হয়ে তাকে পৃথক মর্যাদার অধিকারী করেছে। আমাদের আলোচনায় এই বৈচিত্র্যগুলিকে বিশ্লেষণ করার একটি চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা একটি সাধারণ অনুমান নিয়ে আমাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। মনসামঙ্গল কাহিনীর একটি আদিরূপ ছিল। সেই রূপ ক্রমে আরো পরিবর্তিত হয়েছে পরবর্তী কবিদের রচনায়। এটিকে বোঝার জন্য মনসামঙ্গল কাব্যের কতকগুলি নির্বাচিত প্রসঙ্গোপকরণ নিয়ে কবিদের পারস্পরিক তুলনা-প্রতিতুলনা করা যায়। কিন্তু সমস্যা হল পুঁথি সাহিত্যে কাব্যের প্রাচীনতম রূপের অবিকৃত পরিচয় রক্ষিত হয় নি। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি কানা হরিদত্ত! কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ রচনা কোথাও সংকলিত আকারে পাওয়া যায় না। হরিদত্তের পরের কবি নারায়ণ দেব। তাঁর পদ্মাপুরাণকে আদর্শ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। নারায়ণ দেবের যে গ্রন্থ ছাপা আছে তার মধ্যে কাহিনীর অসম্পূর্ণতা দেখা যায়। ফলে মূল বা আদর্শ হিসেবে তাঁর গ্রন্থকেও গ্রহণ করার অসুবিধে আছে। সেজন্য আমরা প্রধানত তিনটি ধারার কবির কাব্যের তুলনামূলক আলোচনাকেই গুরুত্ব দিয়েছি। এই কারণে জোর দিয়েছি কাব্যের অভ্যন্তরীণ প্রমাণের নানা যুক্তি তথ্যের উপর। মনসামঙ্গল কাব্যের তিনধারার আলোচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গোপকরণকে মূল উপাদান হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনার চেষ্টা আগে হয় নি। এটি সম্পূর্ণ একটি নতুন বিষয়, অথচ যা সমাজ-সংস্কৃতির নিরিখে, ঐতিহ্যপ্রিয় বাঙালীর জীবনরসের নিরিখে একেবারে অনুপেক্ষণীয়।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ পুষ্পজিৎ রায়ের পরামর্শ ও উপদেশ মত আমি মনসামঙ্গল কাব্য বিষয়ে গবেষণার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অঙ্কুশ ভট্টের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁকে মনের কথা জানাই। তিনি আমার ভাবনায় এক কথায় সায় দেন এবং গবেষণার বিষয় সুনির্দিষ্ট করে পুনর্বিন্যস্ত করে দেন। তারপর গবেষণাকাজের প্রতিটি অগ্রগমনে তাঁর প্রাজ্ঞ মতামত ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। মূলতঃ তাঁর সহায়তা ও সহৃদয় অনুপ্রেরণা আমার গবেষণা কর্মের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মালদা জেলা গ্রন্থাগার ও কালিয়াচক কলেজ গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে নানবিধ গ্রন্থ পেয়ে উপকৃত হয়েছি। বিশেষ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক ডঃ অরুণা ভট্টাচার্য ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী রণজিৎ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক গন্ডীর বাইরে যে ব্যক্তিগত সাহায্য আমাকে করেছেন তা ভোলার নয়। তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।